সে ফিরে আসুক

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

প্রাণ চঞ্চল মাঝারী একটা সংসার। স্বামী-স্ত্রী তিন ছেলে তিন মেয়ের সাথে জড়িয়ে অনেক অনেক আত্মীয় স্বজন। অগুণতি বন্ধু বন্ধব ও শুভাকাঙ্খী এই সংসারটার সুন্দর পরিচ্ছন্ন চিত্রটি আমার চোখে পানিবিদ্ধ হয়ে আছে। হয়তো থাকবে চিরদিন। সেই সংসারের মানুষগুলোও থাকবে চিরদিন মন জুড়ে।

একটা সুন্দর কলোনী, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী। শিক্ষিত সব প্রতিবেশী। ছিম্-ছাম্ সাজানো গুছানো সকলের সংসার, প্রতিটা ঘর স্ব-স্ব রুচিতে মূর্ত। ভদ্র কর্তা-গিন্নীর আদুরে আদুরে ছেলে মেয়ে।

শান্ত বিকালে প্রতিঘর থেকে বের হয় ফুটফুটে স্বাস্থ্য উজ্জ্বল ছেলে মেয়ের দল। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে শিশু পার্ক। সেখানে খেলে কলোনীর সব বাচ্চারা পোষাকের বর্ণচ্ছটায় মনে হয যেন মৌসুমী মেলা বসেছে।

গিন্নীদের জন্যেও আছে একটা মিলনায়তন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দু'দিন সবাই একত্র হয় ওখানে, জটলা করে,সেলাই, রান্না, ভাব-ভাষার আদান প্রদান হয়। এমনিভাবে কলোনীর নারী শাখাটা কর্মব্যস্ত থাকে।

আর নর শাখা, মানে ভদ্রলোকদের জন্যেও রয়েছে একটা আড্ডা ঘর যা ক্লাব নামে সুপরিচিত। এই ঘরটার বিভিন্ন বিভাগ রুচিবান সদস্যের জন্যে মনোহর সামগ্রীতে সমৃদ্ধ। পড়ার ঘর, খেলার ঘরের গন্ডির বাইরে রয়েছে বেডমিন্ট কোর্ট। এতে অবশ্য নারীদেরও দখল আছে। এই কলোনীর সবচাইতে চিত্তাকর্ষক হলো টেনিস কোর্ট এখানে প্রতিযোগিতা হয় শহরের বা ডিষ্ট্রিক্টের অন্য প্রতিযোগীদের সাথে। টেনিস কোর্টের কোণের বাড়ীর একটি সংসারের সুন্দর চিত্র আমার চোখে পিনবিদ্ধ হয়ে আছে। সেই সংসারের কিচু ঘটনা মনে হলে দুচোখ জ্বালা করে। বুকে একরাশ যন্ত্রণা আবর্তের সৃষ্টি করে।

প্রথম এদের সাথে আলাপ হয় দুই সংসারের বড় মেয়ের বন্ধুত্বের মাধ্যমে। স্কুল ফেরৎ মেয়ের মুখে শুনতাম হামিদার মামা-মামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের টুকরো টুকরো গল্প। ওদের কথা বলতে গিয়ে আমার স্বল্পবাক মেয়ের মুখে খৈ ফুটতো। একদিনের ঘটনা। স্কুল থেকে ফিরেই আমাদের বড় মেয়ে মুন্নি কাঁদতে শুরু করলো। অনেক কাঠ খড় পুড়ে জানলাম হামিদার সাথে আড়ি হয়েছে। হামিদার সাথে কথা বন্ধ করে এক স্কুলে পড়া সম্ভব নয় কাজেই ঞ.ঈ. র ব্যবস্থা নিতেই হবে। ছেলে মানুষী জেদের বহর দেখে আমরা যত হাসছি ও তত কেঁদেই চলেছে। মেয়ের কান্নাকাটির দেখে আমরা গোপন সিদ্ধান্ত নিলাম বেড়াতে যাবার নাম করে হামিদাদের বাসায় গিয়ে দুই মেয়ের ভাব করে দেবো। গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি ঠিক তখন ওয়াপদার পরিচিত

জীপটি এসে দাঁড়ালো। দুই মেয়ের বাপ মায়ের পরিচিতি হলো। একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে ওদের কথা শুরু হলো। আর সেই সাথে দুটি পরিবার ঘনিষ্ঠতর হলো। শুরু হলো আসা যাওয়া। টেনিস কোর্টের কোণায় হামিদাদের বাসায় গেলেই দেখা যেতো- হয় বেডমিন্টন খেলছেন নয়তো টেনিস। আমাদের জমজমাট চায়ের আসরে খেলা ফেলে যোগ দিতেন। কপাল বেয়েঘাম ঝরতো। একটা তোয়ালে দিয়ে হাঁটু বেঁকে বসতেন। গল্পে হাসিতে ফেটে পড়তেন। বলতেন "এই দু'টি মেয়ের জন্যে এক ঘরে দুটি ভাই খুঁজতে হবে' আর জমজ পেলেতো কথাই নেই।" বলতাম এক, আর হলো আরেক। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। হামিদার শ্বশুরবাড়ী রাজশাহী, মুন্নীর চট্টগ্রামে। স্বামীর কর্মস্থল দূরে হওয়ায় দু'টি মেয়ে আজ একে অন্যের নাগালের বাইরে। দিন কেটে যাচ্ছে ওদের, আমাদের সবার।

এক শীতের সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলাম বাচ্চাদের নিয়ে। আমাদের ছোট্ট মেয়ে ঝুমা টেনিস কোর্টের দিকে তাকিয়ে বললো "চৌধুরী চাচার লজ্জা করে না হাফপ্যান্ট পরতে"। শুনে সবাই হেসে খুন। সেই বাড়ীটায় এখনও যাই। কিন্তু আর দেখা যায় না সেই নির্দিষ্ট লোকটাকে। সেই খেলোয়াড় চৌধুরী, অমায়িক বন্দু বৎসল চৌধুরী কোথায়? সেই সুজন সু-বান্ধব চৌধুরীর কথা ভাবতে গিয়ে কেন বুকের গভীরে উত্তাল তোলপাড়? চোখের পাতায় কেন নরকেল পাতার থির থির কম্প। সেই সুন্দর সঙসারটি এলোমেলো হয়ে পড়ার বেদনার আর্তনাদে আমার স্নায়ু দুব্‌ল হয়ে পড়েছে। ভুলতে পারিনা একাত্তরের একুশে এপ্রিলকে। সুন্দর সংসারটি সেদিন তছনছ হয়ে গেল। নিরানন্দের শীতদলতায় গ্রাস করলো আন্দোজ্জ্বল পরিবারটিকে।

সুসভ্য পৃথিবীর এককোণে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ এ ঘটলো জঘন্যতম আদিমতার প্রকাশ। সে'দিন ঘৃণিত পাক পশুরা কলুষিত করেছে বাংলার পবিত্র ভূমিকে। সে'দিন বাংলার নরম বুকে ঘটেছে শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। বাংলা শ্যামল মাটির বুকে সে লাঞ্চনা দুর্দশা আর হত্যার খবরে উঠেছে সুসভ্য বিশ্ববাসী। আর্তনাদ করে উঠেছে মানবতা।

সেই কালো অধ্যায়ের একুশে এপ্রিলের রাতে কয়েকজন পাক মিলিটারী এসে একটি খবর শোনার জন্যে সার্কিট হাউজে ডেকে সে নিয়ে গিল আর তো ফিরে এলো না মানুষটি। তারপরিবারের সাথে আমারও তাকিয়ে আছ তার আগমন পথের দিকে। হাফপ্যান্ট পরনের খেলার রেকেড হাতেমাঠময় ছুটে বেড়াতে আরতো দেখা যায় না সেই মানুষটাকে। টেনিসবল দেখলেই আমাদের ঝুমা দুঃখ করে বলে, "চৌধুরী চাচা আমাকে এক ডজন পুরানো বল দিয়েছিল।" ঝুমার নিষ্পাপ স্মৃতিকে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার চৌধুরী চাচা। গতিশীল জীবন প্রবাহের প্রতি স্তরে উপলব্ধি করে কল্যানীয় শুভাকাঙ্ক্ষীর স্মৃতি। জীবিত আছে কি নেই অজানা, তবু নেই ভাবতে হৃদয় আর্তনাদ করে উঠে।

প্রতিদিন খবরের কাগজের একটি বিশেষ কলামের উপর পাখীর নীড়ের তো চোখ দু'টো বুলিয়ে যাই। 'ঘরে ফেলার পালা'। পশুদের দেশে আটকে পড়া বাঙ্গালীরা ফিরে আসছে মায়ের কোলে।

তাদের মাঝে যদি একটি চেনা জানা নাম হঠাৎ করে কোন দিনের খবরে কাগজের পাতায় ভেসে উঠে একটি অপ্রত্যাশিত শাপলা পূলের মত? কী এক অহেতুক অনুভূতি আমার হৃদয়ের মণি কোটায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠে। সেই আনন্দানুভূতির সাথে আমার একমাত্র কামনা- চৌধুরী সাহেব ফিরে আসুক, তাঁর পরিবারের মুখে হাসি ফুটুক। তার জেদী ছেলে সুমন তার বাপকে ফিরে পাক। সেই সুখী সংসারটির যে ছবিটা আমার চোখে পিনবিদ্ধ হয়ে আছে- তা আবার আগের রূপ লাভ করুক। এবারের ঈদে পুনঃমিলনের আনন্দে ওদের বাসায় সাত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ উচ্ছলে উঠুক। হাসি, আনন্দ, গানে মুখর হয়ে উঠুক পরিবারটি।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।